ক্ষয়ে যাওয়া সময়

©

বারোমাসি প্রকাশনী

ক্ষয়ে যাওয়া সময়

আফরোজা জাহান

সংবিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ :

লেখক ও প্রকাশকের যৌথ অনুমতি ব্যতীত এই বই বা বইয়ের কোনো অংশবিশেষ ই-বুক বা অনলাইনে প্রকাশ করা যাবে না এবং কোনো যান্ত্রিক উপায়ের মাধ্যমে কোনোরূপ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না। এই ঘোষণা লঙ্ঘনকারীর বিরুদ্ধে যথাযথ আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

বারোমাসি প্রকাশনী

প্রকাশক

মিঁয়া মোহাম্মদ খালিদ সাইফুল্লাহ ফয়সল

ক্ষয়ে যাওয়া সময়
আফরোজা জাহান
গ্রন্থস্বত্ব©লেখিকা
প্রথম প্রকাশ : পৌষ ১৪৩১ ,
জানুয়ারি, ২০২৫
রজব, ১৪৪৬

KHOYE JAOYA SOMOY
AFROZA JAHAN
Copyright @Afroza Jahan
মুঠোফোন ০১৯৭১ ৬১ ১২ ১২ :
অক্ষরবিন্যাস : অলংকরণ ,
বারোমাসি

প্রচ্ছদ : সাহাদাত হোসেন

মুদ্রাক্ষরিক : লেখিকা

মুদ্রণ : রিমা ট্রেড, ৪১২/বি, গাউসুল আজম সুপার মার্কেট, নীলক্ষেত, ঢাকা

প্রধান বিক্রয়কেন্দ্র : বারোমাসি, নাগড়া ফুটব্রীজ, নেত্রকোনা
বিক্রয়কেন্দ্র ১ : বারোমাসি, কদম খাঁ গলি, মিতালি রোড, ঝিগাতলা, ঢাকা
বিক্রয়কেন্দ্র ২ : বারোমাসি, বাড্ডানগর লেন, হাজারীবাগ পার্ক সংলগ্ন, ঢাকা

বিনিময় মূল্য : তিনশত টাকা মাত্র **: US $ 4**
ISBN: 978-984-99551-7-7

ঘরে বসে, কম খরচে এবং বিভিন্ন প্যাকেজ ও বাহারি ছাড়ে যেকোনো প্রকাশনীর বই কিনতে যোগাযোগ :
www.facebook.com/baromashi
www.facebook.com/baromashiprokashoni

উৎসর্গ

যার জন্য শত ক্লান্তি, যন্ত্রণা ভুলে লিখতে বসেছি। আমার হৃদয়ের টুকরা, যাকে 'সখী' বলে ডাকি। আমার দশ মাসের কন্যা 'উনাইসাহ ওয়াজিদ মুনাজাত'কে মায়ের পক্ষ থেকে এই ছোট্ট উপহার। জেনে রেখো, এই বই লেখার সবচেয়ে বড় অনুপ্রেরণা তুমি।

এবং

যাকে বয়ে বেড়াচ্ছি শত রুপে সর্বদা, যে প্রতিনিয়ত বলেছে; পারতেই হবে সেই আমার আমিটাকে। ভিতরের আমিটা জেগে না উঠলে আমি পারতাম না বইটা লিখতে। আমি কৃতজ্ঞ, আমার সেই ভিতরের আমিটার প্রতি।

ভূমিকা

সময়ের উপর ভর দিয়েই চলে মানব জীবনের সকল হিসাব নিকাশ। কিছু সময় রয়ে যায়, কিছু সময় ক্ষয়ে যায়। এই যে জীবন থেকে সময় ক্ষয়ে যাচ্ছে, সেই ক্ষয়ে যাওয়া সময়কে বাঁচাতেই শব্দের কাছে আশ্রয় নিয়েছি। নিজের সকল সীমাবদ্ধতা, ক্লান্তিকে শক্তি বানিয়ে সময়ের সাথে বাঁচতে চেয়েছি।

আর বাঁচতে চাই বলেই দুঃসাহস দেখিয়েছি। আড়াই বছরের পুত্র আর দশ মাসের কন্যাকে নিয়ে একটু একটু করে প্রায় এক মাসে লিখেছি এই উপন্যাস।

পাঠকের হৃদয়ে এটা রয়ে যাবে নাকি স্রোতে ক্ষয়ে যাবে, তাও সময়ই বলে দিবে। এই যে ছোট দুই মানব সন্তানের মায়ের সীমাবদ্ধতা, ক্লান্তি, হতাশার যন্ত্রণাকে পাশে রেখে নিজেকে শব্দ ও বাক্যের মিলনে মুক্তি দিয়েছি, এটাই আমার তৃপ্তি।

যারা নিজের মূল্যবান সময় থেকে এই উপন্যাস পড়বেন, তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা। ভালোবাসা জানবেন।

*প্রতিনিয়ত সাহস দেওয়ার জন্য বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা আর জাযাকাল্লাহু খাইরান, বারোমাসি প্রকাশনী'র প্রকাশক মোহাম্মদ খালিদ সাইফুল্লাহ ফয়সল ভাই'কে।

— আফরোজা জাহান
(২০২৫)

এক

"তুমি জাহান্নামের আগুনে বসিয়া হাসো পুষ্পের হাসি। কীভাবে হাসো?" গম্ভীর মুখে কথাটা বলেই রায়হান তার বুকের সাথে লেপ্টে থাকা হাস্যরত শ্যাম বর্ণের মুখটার দিকে তাকালো। এতো মায়া মেয়েটার চোখে-মুখে! কী সুন্দর করে হাসছে! এই হাসিটা রায়হান আমৃত্যু ধরে রাখতে পারবে তো?

এ অল্প বয়সেই জীবন ওকে মানুষের সকল বিশ্রী রুপ দেখিয়ে ফেলেছে। তবুও, ওর চোখে সারল্যের সাথে মিশে আছে এক অদ্ভুত তেজ। এই কারণেই হয়তো সবার চেয়ে রায়হানের কাছে ওকে আলাদা মনে হয়। আর শুধু তেজ নয়, এই চোখ জোড়া এখন রায়হানের অস্থির জীবনে এক টুকরো প্রশান্তির নীড়। চারপাশ জুড়ে যতই অশান্তি থাকুক, এই চোখে আশ্রয় নেওয়া যায়। হয়তো এসব কারণে আরও বেশি মায়া হয় রায়হানের। স্রষ্টা এতো মায়া যার চেহারায় দিয়েছেন, তার জীবনটা কেন এতো কষ্টের হবে? এই কথাটা প্রায়শই রায়হানের মনে ঘুরপাক খায়। আজ আবার এসব ভাবতে গিয়ে নিজের উপরও রাগ লাগে। সব অশান্তি থেকে মুক্তি দিতেই, তাড়াহুড়ো করে সে জীবনের সবচেয়ে বড় সিদ্ধান্ত নিয়েছিলো। উলটো রায়হানের কারণেই কষ্টের উপর কষ্ট চেপে বসেছে মায়াবতী এই মেয়েটার জীবনে। না রায়হান ওর জীবনে আসতো, না আজ এই দিন দেখতে হতো।

"যার নাম পুষ্প, সে তো পুষ্পের মতোই হাসবে। তাই না? কিন্তু আপনে ভুল কবিতা বলবেন না।"

"তুমি কবিতাও পড়ো নাকি?" রায়হানের কণ্ঠে বিস্ময় ঝরে পড়ে। উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলে উঠে, "বাহ!"

"ভুলটা ইচ্ছে করেই করেছি। আমি'র জায়গায় তুমি বসিয়েছি।" পুষ্প নিঃশব্দে হাসে। মৃদু আলোতে হাসি রায়হানের আড়ালেই রয়ে যায়।

"আমি এনজিও'র যে স্কুলে পড়তাম, সেখানে বাধ্যতামূলক বই বা পত্রিকা সবাইকেই পড়তে হতো। সেই থেকে কাগজে কিছু দেখলেই পড়তে ভালোলাগে। কিছু গল্প, কবিতা পড়া হয়েছিলো। সেখান থেকে অল্প কিছু কবিতা মুখস্থ আছে। একদিন আপনাকে শোনাবো নে। কিন্তু আজ এসব কথা কেন বলছেন?"

"অপরাধবোধ কাজ করছে। কষ্ট পাচ্ছি। এমন জীবনে তোমায় আনলাম, অশান্তি আর অশান্তি। নতুন বউ হয়েও, কত কাজ আর দায়িত্ব এসে পড়েছে তোমার কাঁধে! মা সুস্থ থাকলে এতো কাজ তোমাকে করতেই দিতো না।" দীর্ঘশ্বাস ফেলে রায়হান। "আমার পরিবার আর দশটা পরিবারের মতো না। কিন্তু আমি বুঝিনি পুষ্প, এতোটা খারাপ হবে। ভালো রাখবো বলেছিলাম, কিন্তু জাহান্নামে এনে ফেলেছি।"

"আপনার বুক বুঝি জাহান্নাম? আমি তো হাসতেছি আপনার বুকে মাথা রেখে।"

"হেঁয়ালি করছো, তাই না?"

"কই? না তো। শুনেন, এই চব্বিশ সালটা হচ্ছে আমার জীবনের সবচেয়ে সুন্দর বছর। আমৃত্যু আমি স্মরণে রাখবো। এ বছরই আপনাকে আপন করে পাইছি। ঠিকানাবিহীন, কলঙ্কমাখা একজন মানুষকে পরিচয় ও ঠিকানা দিয়েছেন। দিয়েছেন পরিবার। এটাই তো অনেক। কয়জন এমন করে, কন?"

"আর পরিবার! এটাকে পরিবার মনে হয়? তুমি নিজেই তো দেখলে এদের ব্যবহার। মাঝেমধ্যে কী মনে হয়, জানো?" পুষ্পের উত্তরের অপেক্ষা করে না রায়হান বলে চলে। "মনে হয়, মা ছাড়া আর কারো কিছু যায় আসে না, আমার থাকা, না থাকাতে। আসলে এটা নামে পরিবার, এখানে কেউ কারোর না। এটাই সত্য। এক ছাদের নিচে থাকলেই কেউ পরিবার হয় না, পুষ্প। তবুও বারবার এই ঠিকানায় ফিরে আসি। কেন আসি জানি না। হয়তো মায়ের জন্যই আসি।"

"তাও তো বলতে পারেন। আপনার পরিবার। কেউ কারোর না হয়েও ডাকতে পারেন। আমার তো ডাকার মতোও কেউ নাই পৃথিবীতে।"

রায়হান দীর্ঘশ্বাস ফেলে। নিজের নাকি পুষ্পের দুঃখে, তা পুষ্প জানে না। পরিবেশটা কেমন ভারী হয়ে যাচ্ছে। পুষ্পের খারাপ লাগে। রায়হানের পাগলামিতে সায় দেওয়া ওর উচিত হয়নি। জীবন তো ওর এমনই এলোমেলো। এখন ওর কারণে এই মানুষটার জীবনটা আরও কঠিন হয়ে গেছে। কী বলবে, কী করবে এই গম্ভীর পরিবেশটা ঠিক করতে, পুষ্প ভেবে পায় না। কিছুক্ষণ চুপ থেকে সব সংকোচ ঝেড়ে ফেলে রায়হানের কোমড়ে সুড়সুড়ি দেয়!

"এই! কী করছো?" বলেই বাইন মাছের মতো মোচড় দিয়ে উঠে রায়হান। তা দেখে হাসি আটকাতে পারে না পুষ্প। এতো অশান্তির মধ্যেও একটা আশ্রয়, পরিচয় আর স্বীকৃতি, মানুষের জীবনকে অন্যরকম করে দেয়, তা পুষ্পকে না দেখলে রায়হান কখনোই বুঝতো না। সব কষ্ট ভুলে কী উচ্ছ্বাস নিয়ে হাসছে মেয়েটা!

রাতের নীরবতায় পুষ্পের হাসি, মধুর ধ্বনি হয়ে রায়হানের ছোট্ট ঘরটায় ছুটে বেড়াচ্ছে। পুষ্পের হাসির সাথে মিলিত হয় রায়হানের মৃদু হাসি। তখনই ইঁদুর ধরার মতো সেই হাসিকে তাড়িয়ে বেড়াতে পাশের ঘর থেকে খাঁখারি দিয়ে উঠে লাইলী বানু।

"নোংরা মেয়ে-ছেলে। জন্মের কোন ঠিক নাই। ছ্যামড়াডার মাথা তো খাইছেই। এক কাপড়ে নাচতে নাচতে চইলা আসছে এই সংসারটারে খাইতে। এমুন মাইয়া কতটুকুই বা ভালো হইবো? যে ছ্যামড়া জীবনেও আমাগো লগে চোখ তুলে কথা কয় নাই, হেই ছ্যামড়া এখন আমগো চোখের দিকে তাকাইয়া বড় বড় কথা কয়। ছ্যামড়ারে বশ কইরা নির্লজ্জের মতো হাসতাছে ছেমড়ি। ছিহ... ছিহ..."

ঠিক কতটুকু কথা রায়হান আর পুষ্পের কানে গিয়েছে কে জানে! জানালার ধারেই যেন ঘাপটি মেরে বসেছিলো নীরবতা। হুট করেই তা ঘরে ঢুকে গিয়েছে। তাই তো হাসির শব্দ মিশে যায় দেয়ালের বুকে।

দুই

ভাদ্রের তাল পাকা গরমে নাভিশ্বাস উঠে যাচ্ছে বিউটির। মনে হচ্ছে, টিনের এই ঘরের চারপাশে কেউ আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। এতো ছোট ঘর নিজের শ্বাস-প্রশ্বাসও বাহির হবার যেন জায়গা নেই। বস্তির বেশিরভাগ ঘরই এমন। গুটিকয়েক ঘর বড় আছে, তাতেও কত মানুষের চোখ। ঐ চোখ উপেক্ষা করে থাকতে পারে তারাই, যাদের কাঁচা পয়সা আর ক্ষমতা আছে।

প্রায় পাঁচ মাস আগে এই বস্তিতে এসে এই ঘরটাই খালি পেয়েছিলো ওরা। এই শহরে এসে বুঝেছে খাওয়ার অভাব তেমন নেই। কিন্তু মাথার উপর একফালি নিরাপদ ছাদের অভাব ওটার চেয়ে বেশি। বস্তির এই ঘরটা যেমনই হোক, নিজের মতো থাকতে তো পারছে, এটা ভেবেই এখন বিউটি স্বস্তিবোধ করে।

প্রথম প্রথম অবশ্য বস্তির ঘর নিয়ে নাক সিঁটকাতো। এইটুকুন ঘরের ভাড়া নাকি তিন হাজার টাকা! একটা মাত্র ফ্যান আর লাইট জ্বলে। সেজন্য বাড়তি আরও পাঁচশ দিতে হয়। এদিকে খালের এই পাড়ের বস্তিতে কারেন্টই থাকে না বেশিরভাগ সময়। ঘরের একটা মাত্র জানালা, তা খালমুখী। নদী বা খাল পাড়ের বাড়িতে থাকার স্বপ্নটা ছোট থেকেই। স্বপ্ন দেখতো এমন একটা বাড়িতে থাকবে, যেখানে জানালা খুললেই হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকবে, ঠান্ডা জলের সাথে মিশ্রিত বাতাস। গ্রামের খালা, চাচিরা বলতো, পানি আর বাতাসের মিলন হলেই এমন বাতাস বয়। ঐ স্বপ্ন সত্যি হলেও বিউটির মনে তা নিয়ে আর কোন আদিখ্যেতা অবশিষ্ট নেই।

কারণ, ঐ পানি আর বাতাসের মিলনের ঠান্ডা বাতাস কপালে নেই, বিউটি তা বুঝে গিয়েছে। খালমুখী ঘর হলেও পঁচে যাওয়া পানি আর ময়লার গন্ধে নাকে তালা লেগে যায়। সাথে মশা, মাছির যন্ত্রণা তো আছেই। গরমে টিকতে না পেরে আজ জানালাটা খুলে দেয় বিউটি। ময়লার গন্ধও সহ্য করে নিবে, কিন্তু এই গরম আর সহ্য হচ্ছে না।

ছয় মাসের পেটটা নিয়ে সে চৌকিতে উঠে বসে। 'মনে রেখো আমায়' লেখা হাতের কাজ করা কাপড়ের পাখাটা নিয়ে বাতাস করে নিজেকে। তাও গরম কমে না, উল্টো হাঁসফাঁস লাগে, শরীরে জ্বালা করে। শাড়ির আঁচলটা কাঁধ থেকে নামিয়ে ফেলে। ফুলে উঠা পেট নিয়ে বেশিক্ষণ বসে থাকতেও ক্লান্তবোধ হয় সতেরো বছরের বিউটির। তেল চিটচিটে বালিশে মাথা রেখে পেটের দিকে তাকিয়ে থাকে অপলক, ভিতরের সত্তা মায়ের তাকিয়ে থাকা বুঝে কিনা কে জানে? এমন সময় ঢেউ খেলে যায় পেটে, কেমন একটা সুড়সুড়ি ভাব হয়! পরক্ষণেই পেটের বাচ্চাটা জোরে জোরে দুইটা লাথি মারে। লাথির ব্যথায় নাকি অন্য ব্যথায় বিউটির চোখ দিয়ে পানি গড়িয়ে পড়ে বালিশে। তেল চিটচিটে বালিশ সেই নোনা জল শুষে নিতে কিছুটা সময় নেয়। শহুরে জীবনে এই সময়টুকুও আজকাল কেউ কাউকে দেয় না।

কাজে যাওয়ার আগে চা আর সিগারেট খাওয়ার জন্য বস্তি থেকে কিছুটা দূরে বশিরের টং দোকানে দাঁড়ায় রানা শেখ। বশির ভাইয়ের আদা চা এক কথায় অসাধারণ। এখন সকাল দশটার মতো বাজে, তাতেই রোদের এতো তেজ। মনে হচ্ছে এইবারের গরমে শুধু তাল নয়, মানুষও পেকে যাবে। আজকে ডিউটিতে যেতে মন চায় না রানা শেখের। নামের কারণেই কিনা কে জানে, শেখদের মতো আরাম আয়েশ করতে মন চায়। ইউটিউবে দেখেছে আরবের শেখদের কী আরামের জীবন! কেন যে গরিবের ঘরে জন্মালো? তাও ভালোই যাচ্ছিলো দিন। জুয়া খেলে, আড্ডা দিয়ে আর মেয়ে দেখে দিন কেটে যেতো। কোন কোন রাত কাটতো আরও মধুরভাবে। কিন্তু 'বিয়ে'র যন্ত্রণায় পড়ে কোথায় যে সে ফেঁসে গেলো!

এসব ভাবতে ভাবতেই ডান হাতে থাকা কাপ থেকে একবার চায়ে চুমুক দেয়, আবার বাম হাতে থাকা সিগারেটে টান মারে আয়েশ করে। সেই সময়ই টং দোকানের সামনে একটা রিক্সা এসে থামে। পাঞ্জাবি পরা কবি কবি ভাবের এক লোক রানার সামনের বেঞ্চে এসে বসে। লোকটার দিকে একবার তাকিয়ে রানা সিগারেটে আরেকটু টান দেয়। কোথা থেকে দুইটা কুকুর ছুটে এসে দাঁড়ায় টংয়ের সামনে। দোকানের সামনে থাকা দুইটা বেঞ্চ শুঁকে শুঁকে কী যেন পরীক্ষা করে! রানা চায়ের কাপটা রেখে দুইটা বিস্কুট সামনে থাকা কৌটা থেকে বাহির করে ছুঁড়ে মারে কুকুর দুইটাকে লক্ষ্য করে। ধূলো মেখে দুইদিকে পড়ে থাকে দুইটা বিস্কুট। কুকুর দুইটার কোন আগ্রহ নেই বিস্কুটের দিকে। তারা একে অপরের গায়ের গন্ধ শুঁকে এরপর রতিক্রিয়ায় রত হয়! টং দোকানের মালিক বশির হুঁশ হুঁশ করে উঠে। "যা কইলাম। যা যা..."

রানা তাকে আটকায়। "আরে, বশির ভাই৷ কী করতাছেন? কামে ক্যান বাঁধ সাধেন? করতে দ্যান ওগো।"

কুকুরদের রতিক্রিয়া দেখতে ভালো লাগে রানার। গরম আবহাওয়া, ধোঁয়া উঠা চা আর জ্বলন্ত সিগারেট যা পারেনি, তাই হয় রানার। কুকুর দুইটার দিকে তাকিয়ে থেকে শরীর গরম হয়ে উঠে। ভাল্লাগে না কিছুই। দোকানদারের হাতে টাকাটা দিয়ে আবার বস্তির দিকেই হাঁটা ধরে। কুকুর দু'টো এখনো রতিক্রিয়ায় রত। বশির সেদিকে তাকিয়ে আবার হুঁশহুঁশ করে। কিন্তু সেদিকে হুঁশ নেই কুকুর দুইটার। কবি কবি চেহারার লোকটাও সেইদিকে তাকিয়ে থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে। মনে পড়ে, আজ আটটা বছর স্ত্রী থেকেও কেমন ঠান্ডা শীতল রাত কাটায় সে!

একটা সুন্দর বাগানে হাঁটছে বিউটি। কী মিষ্টি বাতাস বইছে! পানি আর বাতাসের মিলনের বাতাস, ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা ভাব। বিউটি চারদিকে তাকায়। কিন্তু এতো বড় বাগানে কোন ফুল নেই। কেমন বিষণ্ন একটা ভাব চারদিকে। বিউটি ঘুরে ঘুরে ফুল খুঁজে। কোথাও কোন ফুল নেই এটা কীভাবে সম্ভব! ভাবতে ভাবতেই একটা মিষ্টি ঘ্রাণ

তিন

অগ্রহায়ণের মিষ্টি রোদ গায়ে মেখে কারো অপেক্ষায় বসে থাকতে বেশ লাগছে রিনির। যদিও মেঘের সাথে লুকোচুরিতে ব্যস্ত সূর্য। পা থেকে জুতোজোড়া খুলে আরও আয়েশ করে বসলো ঘাসের উপর। ঘাসের ঠাণ্ডা পরশে চোখ বুজে আসে আরামে। নানাবাড়ির কথা মনে পড়ে যায় রিনির। বছরে একবার পরীক্ষা শেষে এই অগ্রহায়ণ মাসেই যাওয়া হতো নানাবাড়ি। এই সময়টাতে রিনি মুক্ত পাখির মতো ঘুরে বেড়াতো। ভোরে কুয়াশার মাঝে বাহির হয়ে গেলেও ছিলো না বাবার বিধিনিষেধ আর মায়ের চোখ-রাঙ্গানী। কীভাবেই বা দিবে চোখ রাঙ্গানী! নানাবাড়ি আসলেই ফজরের নামাজ পড়েই মা শিমুল তুলোর লাল লেপের নিচে নিজেকে বিলিয়ে দিতো। আর তখনই বাড়ির পিচ্চিদের সাথে সুযোগ বুঝে ঘর থেকে বেড়িয়ে পড়তো রিনি। সেই সময়টাতেই দেখতো সবুজ পাতা, ঘাসের ডগা আর ধানক্ষেতের অবশিষ্ট নাড়াতে চকচক করছে শিশির বিন্দু। পানির ফোঁটা কীভাবে ঝুলে থাকে এটাই ছিলো ছোট রিনির কাছে সেই সময় সবচেয়ে বড় বিস্ময়। যদিও এই শহুরে জীবনে শিশিরের দেখা পাওয়া মুশকিল। আর এমন দুপুরে তো আরও অসম্ভব। তবুও হালকা ঠাণ্ডা অনুভব হচ্ছে রিনির পায়ে।

অগ্রহায়ণ রিনির প্রিয় মাস। আজকের দিনটা আরও প্রিয়। তাই আজ সে শাড়ি পরেছে। লাল-কালো গঙ্গা-যমুনা পাড়ের সাদা জমিনের মণিপুরী শাড়ি। সাথে লাল রঙের পাতলা চাদরে নিজেকে জড়িয়ে রেখেছে। চাদরের গা জুড়ে লেখা অঞ্জন দত্তের গান 'তুমি না থাকলে সকালটা এতো মিষ্টি হতো না'। কৈশোর থেকেই এটা রিনির প্রিয় গান। ও মনে মনে এমন একজনকেই খুঁজে। যার জীবনে এই গানের মতোই রিনি না থাকলে সকালটা মিষ্টি হবে না।

রিনি জানে, আজ ওকে পরীর মতো সুন্দর লাগছে। যদিও কেউ খেয়াল না করলেও, একজন ঠিকই খেয়াল করবে। পরিচয়ের পর থেকে রিনি যতবার সাদা জামা পরে ক্যাম্পাসে এসেছে, ততোবার মানুষটা কী সহজাতভাবে বলেছে, "সাদাতে তোমাকে মানুষ না, পরী লাগে, রিনি। মনে হয় আকাশ থেকে মাত্র নেমে এসেছো।"

ব্যস এইটুকুই!

এইটুকু কথাতেই যেন জাদু আছে। আছে মুগ্ধতার পরশ। তাই, কথাটা শুনলেই রিনির মনটা এতো ভালো হয়ে যায়। সেই সাথে এতো লজ্জা লাগে! লজ্জায় মানুষটার দিকে তাকাতেও পারে না। মানুষটা মনে হয় বুঝে, রিনি লজ্জা পাচ্ছে। তাই তো ওর প্রশংসা করেই বেশিরভাগ দিন কাজ আছে বলে পালিয়ে যায়। রিনিরা বিকেল অব্দি আড্ডা দিলেও, সে থাকে না। ক্লাস করেই দেয় ছুট। কখনো অবশ্য জিজ্ঞেস করা হয়নি, কীসের এতো তাড়া?

রিনি আজ সাদা পরেছে তার উপর শাড়ি। আজও নিশ্চয়ই বলবে, ওকে পরী লাগছে। যতই কাজ থাকুক, আজ তাকে পালাতে দেওয়া যাবে না।

"কীরে, কোথায় না যাবি তুই? চল, দেরি হয়ে যাচ্ছে। দেরি করে ক্যাম্পাসে আসলি। তোর সাথে সাথে সকালের ক্লাসও আমার করা হলো না। আজ তুই কেন যে শাড়ি পরতে গেলি? আর ক্লাস যখন করবিই না, ক্যাম্পাসেই বা কেন এলি? যদিও ভালো হয়েছে, ক্যাম্পাসে আসলেও নাজমুল স্যারের ক্লাসটা করতে হলো না। না জানি কাল কী করে, স্যার? আবার না তার রুমে ডাকে..."

"রুমে কেন ডাকবে? স্যারের পরীক্ষা খুব বাজে হয়েছে তোর? ফেল করবি নাকি?" রিনির এতোগুলো প্রশ্নের মধ্য থেকে কোনটারই উত্তর না দিয়ে হাতঘড়ির দিকে তাকায় স্বর্ণা।

পুব দিকের ক্যাম্পাস লাগায়ো মসজিদ থেকে ভেসে আসে আজানের সুর। যোহরের আজান দিচ্ছে। স্বর্ণা কেমন অসহায় দৃষ্টি নিয়ে চারপাশে চোখ বুলায়। এই তো মিনিট পনেরো আগেও, কী সুন্দর ঝলমলে রোদ ছিলো। এখন কেমন একটা ধোয়াঁশাভাব আবৃত করে রেখেছে পুরো ক্যাম্পাসটাকে। সূর্য আকাশে থাকলেও, এখন মেঘে ঢেকে আছে বলে তার কোন তেজ নেই। ঘোড়ার পিঠে যেন উঠে বসেছে সূর্য। প্রকৃতি আসন্ন শীতের বার্তা দিতেই এতো দ্রুত ছুটতে থাকে সময়, যেন জীবন ও সময় মিলেমিশে বিষণ্ণ হয়ে আছে। রিনিকে আবার তাড়া দেয় স্বর্ণা।

রিনিদের পাশের এলাকায় মেয়েদের হোস্টেলে থাকে স্বর্ণা। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি কোচিংয়ে গিয়ে বন্ধুত্ব। ভাগ্যক্রমে দুইজনই এখন একই ডিপার্টমেন্টে ভর্তি হয়েছে। রিনির সাথে ওদের ব্যক্তিগত গাড়িতেই যাতায়াত করে স্বর্ণা। এ সুবাদে বন্ধুত্বটা আগের চেয়ে আরও গাঢ় হয়েছে। তাই, রিনি ক্লাস না করলে বেশিরভাগ সময় স্বর্ণাও ক্লাস করে না। রিনি বুঝে, নিম্নবিত্ত পরিবারের বাবা মরা মেয়ে স্বর্ণা। ওর সাথে আসা-যাওয়ার কারণে যাতায়াতের যে খরচ বেঁচে যায়, তা অন্য কাজে লাগাতে পারে।

স্বর্ণার কাছ থেকে কোন উত্তর না পেয়ে কিছুটা বিরক্ত হয় রিনি। এর উপর ক্যাম্পাসে আসার পর থেকেই, স্বর্ণার তাড়া দেওয়া তো আছেই। স্বর্ণার এই তাড়া দেওয়াটা আজ মোটেও রিনির ভালো লাগছে না। এতো কী কাজ ওর! রিনির সাথে গাড়িতে এসেছে আবার রিনির সাথেই তো হোস্টেলে ফিরবে। তাছাড়া সবাই না জানুক, স্বর্ণার তো আজকের দিনটা ভুলে যাবার কথা না। মেয়েটার আজকাল কী যে হলো? রিনির চেয়েও প্রাণোচ্ছল ছিলো। গত কয়েক মাস থেকেই অন্যমনস্ক আর মনমরা থাকে। দেখলে মনে হয় কিছু নিয়ে ভয়ে আছে। বাসায় কোন সমস্যা না তো! স্বর্ণাকে জিজ্ঞেস করে, "এই, তোর ফেসবুক আইডির কী হয়েছে রে?"

স্বর্ণা আমতা আমতা করে উত্তর খুঁজে ফেরে। ওকে বাঁচাতেই যেন শিমুল, শান্ত, রাকিব, সুমি আর বিজলীর আগমন। রিনিকে ঘিরে হৈ হৈ করে উঠলো। শুভেচ্ছা জানালো। সবার শুভেচ্ছার শেষে শিমুল তার পিছনে থাকা হাতটা সামনে এনে রিনির সামনে ধরলো, একটা কেকের প্যাকেট। মুখে কিছু বললো না। কালো জ্যাকেটের চেইন খুলতে শুরু করলো।

চার

"আমি একজন বেশ্যার মেয়ে।" কথাটা শুনে ঘরে থাকা বাকি তিনজনের মতোই চমকে গেলো রায়হানও। অন্যরা যে ভালোই চমকেছে, তা তাদের দিকে তাকিয়েই বুঝেছে। হাতে থাকা কাগজের দিকে তাকিয়ে নাম, বয়স টুকে নিচ্ছিলো রায়হান। সেসব কাজ বাদ দিয়ে এখন খুব আগ্রহ নিয়েই একুশ বছর বয়সী মেয়েটার দিকে লক্ষ্য করলো। কালো হিজাব পরে ওদের সামনে বসে আছে, মুখে সাজসজ্জার ছিটেফোঁটাও নেই। বরং ঠোঁটের একপাশে কাঁটা দাগ আছে। তবুও কী অসাধারণই না লাগছে মেয়েটাকে দেখতে। পড়ন্ত এক অগ্রহায়ণের সকাল। শীত এখনো তেমন জেঁকে বসেনি। সকালের দিকে গায়ে একটা পাতলা চাদর বা সোয়েটার পরে নিলে আরাম আরাম অনুভূতি হয়।

এমন দিনে সকাল সকাল বের হতে একদমই ভালো লাগে না রায়হানের। তবুও এই জরিপটা জরুরি, তাই আজ আরামের ঘুম বাদ দিয়ে এখানে এসেছে। সুবিধাবঞ্চিত নারীর মানসিক বিকাশ, যৌন নিপীড়ন ও জীবন ভাবনা নিয়ে একটা জরিপের আয়োজন করেছে 'আলোর মিছিল' নামের এনজিও। এই এনজিও থেকেই কিছু এতিমখানা, দুস্থ নারী ও শিশু পুর্নবাসন কেন্দ্রে এই জরিপ চালানো হবে। এই জরিপে বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু ছাত্র-ছাত্রীও অংশ নিয়েছে। এর প্রেক্ষিতেই রায়হান 'নারী শক্তি' নামের নারী ও শিশু পুর্নবাসন কেন্দ্রে এসেছে। বিভিন্ন নারীর জীবনের গল্প শুনছে আর অবাক হচ্ছে। লজ্জা লাগছে নিজেকে পুরুষ ভাবতে। পুরুষ জাতি কীভাবে এতো নির্মম আর নির্লজ্জ হয়?! সবাই নিজের জীবনের কথা অকপটে বলতে পারে না, লজ্জা, সংকোচে। এনজিও থেকে বলা হয়েছে, যারা নিজেদের গল্প বলতে চায়, তাদেরটা কেস স্টাডি হিসাবে নেওয়া হবে। যারা বলতে অপারগ, তারা শুধু প্রশ্নের উত্তরে 'হ্যাঁ' 'না' বলে জরিপে অংশ নিবে। তাও কোন জোর নয়। কোন ছবি তোলা যাবে না। কেউ নাম, পরিচয় গোপন করতে চাইলে সেই স্বাধীনতাও তারা পাবে। ওদের কাজের মধ্য দিয়ে কোনভাবেই যেন